বৈশাখী শোভাযাত্রা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি

ইরানী বিশ্বাস

চৈত্রের দাবদাহ শেষে আগমনের ঘণ্টা বাজে দরজার ওপারে। নবপরিনীতা রূপে দাঁড়িয়ে ফল-ফসলে সজ্জিত বৈশাখ। তাকে সাড়ম্বরে বরণ করতে জেগে ওঠে বাঙালি। সুবে বাংলার রাজা অশোকের হাত ধরে পহেলা বৈশাখের শুরু হলেও প্রচলন পেয়ে যায় আকবরের সময়ে। সেই থেকে বাঙালি নিজের করে নেয় পহেলা বৈশাখের সংস্কৃতি। তখনো বিদেশি সংস্কৃতি নিজের করে ভাবতে শিখেনি বলেই হয়তো পহেলা বৈশাখ কেবল আমার সংস্কৃতি বলে দাবি করতো। সময়ের পথপরিক্রমায় বৈশাখের সংস্কৃতিতে যোগ হয়েছে কতোশত সংযোজন। আবার কতো কিছুই হয়েছে বিয়োজন, কে মনে রেখেছে। তবু শিবরাত্রির সলতের মতো নিভু নিভু জ্বলতে থাকে বাঙালির প্রাণের পহেলা বৈশাখ।

প্রথম ১৯৬৭ সালে রাজধানীর রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখের সূর্যোদয়ের সময় সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছায়ানট। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই মূলত নববর্ষ বরণের সাংস্কৃতিক উৎসবকে সারা দেশে বিস্তারিত হতে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। এর পর থেকে পহেলা বৈশাখ মানে ছায়াটনের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। বাঙালির পহেলা বৈশাখ মানেই ছায়ানটের প্রভাতী সংগীত। এ যেন আমে দুধে মাখামাখি। কেবলমাত্র ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বৈরী পরিবেশের কারণে অনুষ্ঠান হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে বর্ষবরণের এ অনুষ্ঠান অব্যাহত রয়েছে। এমনকি ২০০১ সালে এ অনুষ্ঠানে জঙ্গিদের ভয়াবহ বোমা হামলার পরেও অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় এতটুকু ছেদ পড়েনি।

পরবর্তীতে বর্ষবরণে যুক্ত হয়েছে চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা। পহেলা বৈশাখের আগে থেকেই চারুকলার প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসব শুরু হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে পহেলা বৈশাখের থিম ঠিক করা হয়। সে অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের মুখোশ বানানো হয়। নানান পশু-পাখির প্রতীকি অবয়ব বানানো হয়। এছাড়া বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে রকমারি কারুপণ্যের সম্ভার নিয়ে বৈশাখী মেলা শুরু হয়। এ মেলায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হস্ত শিল্প নিয়ে বিক্রেতারা অংশগ্রহণ করেন। বছরের একটা দিন প্রায় সকলেই বাঙালিত্বকে ধারন করতে নানান ধরনের মাটির জিনিসপত্র, পাটের তৈরি ব্যাগ, কাপড়ের তৈরি দেশি পোশাক, বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে।

এদিন সবাই পোষাকে, খাবারে বাঙালি হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বৈশাখী মেলায় পাওয়া যায় বাঙালির ঐতিহ্যবাহি বাতাসা, মোয়া, নাড়ু। বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি তথা সংগঠন আয়োজন করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কোনো কোনো গ্রামে ঘোড়দৌড়, গরুদৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া নৌকা বাইচ, পুতুল নাচ, সার্কাসের আয়োজনও করা হয়। কোথাও কোথাও কবির লড়াই, কবিগান, বয়াতি আড্ডার ব্যবস্থা করা হয়। দেশের জাতীয় টেলিভিশনসহ প্রায় সবকটি চ্যানেলে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

একটি জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচয় করানোর দায় থাকে অভিভাবকদের। সংস্কৃতি এক দিনে যেমন তৈরি হয় না, তেমনি চাইলেই বদলানো যায় না। সময় এবং প্রয়োজনে শুধুমাত্র কিছুটা সংযোজন-বিয়োজন করা হয়ে থাকে। কী এমন প্রয়োজন হলো যে বাংলা সংস্কৃতিকে পরিবর্তনের জন্য আদালতের দারস্থ হতে হলো। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে পহেলা বৈশাখ থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধ করা হোক। এমন চিন্তাধারা এক শ্রেণির মানুষের মানষিক বৈকল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজের এই শ্রেণির মানুষের ধারনা, মঙ্গল শোভাযাত্রা অন্য ধর্মের রীতি। অথচ পহেলা বৈশাখটাই বাঙালির নিজস্ব। বাঙালিত্ব বাদ দিয়ে আমরা ধর্মীয় দিকটাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। তাহলে বলা যায়, আমরা বাঙালি পরিচয়ের চেয়েও বেশি ধর্মীয়ভাবে পরিচিত। ইতিহাস থেকে জানতে পারি, বাঙালি ভাষার জন্য ধর্মীয় আন্দোলন করেনি। স্বাধীনতার জন্যও ধর্মীয় আন্দোলন করেনি। এ দুটি জায়গায় এ দেশের মানুষ বাংলা ভাষা এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। কেউ কিন্তু ধর্মের জন্য লড়াই করেনি। তাহলে স্বাধীন দেশে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দিয়ে বাঙালিকে বিভাজন করার কারণ বোধগম্য নয়।

মানুষ এখন আর রাত জেগে জারি গান শুনতে যায় না। সে যায়গা দখল করেছে রেকর্ড করা ডিজিটাল গান। জারি, সারি, লালন, রবীন্দ্র-নজরুল, রাধারমন, শাহ আব্দুল করিম, ভাটিয়ালীকে কোণঠাসা করে মেটাল মিউজিকের সঙ্গে ইকো সিস্টেমে জারিত গানের বিপুল কদর হঠাৎ বেড়ে গেছে। দিন বদলের সঙ্গে সমাজের সকলেই পালে হাওয়া লাগায় না। কেউ শেকড় আঁকড়ে থাকতে ভালবাসে। অনেকেই এখনো বাঙালির নিজস্ব সংগীতে মগ্ন আছেন। তারা চুপিসারে অন্তরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। নবপ্রজন্মকে শেকড় সংগীতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়বোধ থেকে সরে গিয়ে ভুল সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে যাচ্ছে অনেকেই। তারাই মূলত বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি হত্যার জন্য তলোয়ারে শান দিচ্ছেন। আর এরাই আজকের শিশুর মস্তিষ্কে মৌলবাদের বীজ বপণ করছেন।

যারা সকালের অনির্বচনীয় বিলাসখানি টোড়ি, কোকিলডাকা বিকেলের বিলাবল, প্রথম রাতের বেহাগ, মাঝরাতে হেলে পড়া চাঁদের দরবারি কানাড়া আর মালকোষ ভুলে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতি বন্ধে পায়তারা করছে। যারা আজ মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধের দাবি তুলছে তারা কেউই হয়তো কৈশোরে আব্বাস উদ্দীনের গান শোনেনি, লালনের গানের অর্থ বোঝেনি। এমনকি বাবার পকেটের টাকা চুরি করে গুলিস্তান সিনেমা হলে মেটিনি শো না দেখতে পাওয়ার অব্যক্ত যন্ত্রনা পুষেও রাখেনি। বিকেলে টিউশান ফাঁকি দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কালবেলা' মঞ্চনাটক দেখেনি। অথবা শীতের রাতে গ্রামের রাস্তায় নট্টকোম্পানির যাত্রাপালা 'দেবীচৌধুরানী' দেখে যারা বাড়ি ফেরেনি তারাই আজকের মঙ্গল শোভাযাত্রার বিরুদ্ধাচারণ করছেন। ভয় হচ্ছে এ কারণেই নব্য অজ্ঞান শিক্ষিতের হার বাড়ছে এ দেশে। বাংলা সংস্কৃতি ভুলে ভিনদেশি পোষাক আর সংস্কৃতিতে মনোনিবেশ করা বাঙালি যেন দিন দিন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে মাত্র কিছুদিনের মধ্যে চেনা চোখগুলো অচেনা হয়ে গেল। ধর্মীয় অপব্যাখ্যা আর আচরণের ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে স্বজন-প্রিয়জন। রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন বাংলাদেশে এখন যেন আর বাঙালির বসবাস নেই। সেখানে ভিড় করে আছে ধর্মীয় লেবাসে ঢাকা অপরিচিত মানুষজন।